আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৎকালীন আরবের ভৌগলিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা (العَرَبُ، الأَرْضُ وَالشَّعْبُ، الحُكْمُ وَالْاِقْتِصَادُ، الدِّيَانَةُ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

দ্বীনে ইবরাহীমীতে কুরাইশগণের বিদ‘আত সংযোজন:

দ্বীনে ইবরাহীমীতে কুরাইশদের সংযোজিত ও অনুসৃত বিদ‘আত সমূহই ছিল জাহেলিয়াত আমলের আরববাসীগণের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মূলরূপ। ইবরাহীম (আঃ) প্রবর্তিত সত্য ধর্মের কোন কোন আচার অনুষ্ঠানের কিছু কিছু অংশ তখনো অবশিষ্ট ছিল। অর্থাৎ ইবরাহীম (আঃ) প্রবর্তিত দ্বীনকে তাঁরা সম্পূর্ণ রূপে ছেড়ে দেননি, ফলে বায়তুল্লাহর প্রতি তাঁরা যথারীতি সম্মান প্রদর্শন এবং ত্বাওয়াফ করতেন, ওমরা এবং হজ্জ পালন করতেন, আরাফা এবং মুযদালিফায় অবস্থান করতেন এবং হাদয়ীর পশু কুরবাণী করতেন।

সনাতন ইসলামের কিছু কিছু রীতিনীতি এবং আচার অনুষ্ঠানাদি পালন করলেও প্রকৃতপক্ষে ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁরা এত বেশী শির্ক-বিদ’আতের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন যে, সত্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। আরববাসীগণ আরও যে সব বিদ‘আতের প্রচলন করে নিয়েছিল তা হচ্ছে যথাক্রমে নিম্নরূপ :

১. কুরাইশরা দাবী করতেন যে, তাঁরা হচ্ছেন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর এবং তাঁরাই হচ্ছেন হারাম শরীফের সংরক্ষক ও অভিভাবক এবং মক্কার প্রকৃত অধিবাসী। কোন ব্যক্তিই তাঁদের সমকক্ষ নয় এবং কারো প্রাপ্য তাঁদের প্রাপ্যের সমান নয়। এ সব কারণে তাঁরা নিজেরাই নিজেদেরকে ‘হুমস’ (বীর এবং শক্তিশালী) আখ্যায় আখ্যায়িত করতেন। কাজেই, তাঁরা এটা মনে করতেন যে, হারাম সীমানার বাইরে অগ্রসর হওয়া তাঁদের উচিত না। তাই হজ্জ মৌসুমে তাঁরা আরাফাতে যেতেন না এবং সেখান থেকে তাঁরা তাওয়াফে ইফাযাও করতেন না। তাঁরা মুযদালিফায় অবস্থান করতেন এবং সেখান থেকেই তাওয়াফে ইফাযা করে নিতেন। তাঁদের সেই বিদ‘আত সংশোধনের জন্য আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

(ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) [البقرة:199]

‘তারপর তোমরা ফিরে আসবে যেখান থেকে লোকেরা ফিরে আসে।’ (আল-বাক্বারাহ ২ : ১৯৯) [1]

২. এদের আরও একটি বিদ‘আতের ব্যাপার ছিল, তাঁরা বলতেন যে, হুমসদের (কুরাইশ) জন্য ইহরামের অবস্থায় পণীর এবং ঘী তৈরি করা ঠিক নয় এবং এটাও ঠিক নয় যে, লোম নির্মিত গৃহে (অর্থাৎ কম্বলের শিবিরে) প্রবেশ করবে। এটাও ঠিক নয় যে, ছায়ায় অবস্থানের প্রয়োজন হলে চামড়ার তৈরি শিবির ব্যতীত কোথাও অন্য কোন কিছুর ছায়ায় আশ্রয় নেবে।[2]

৩. তাঁদের আরও একটি বিদ‘আতের ব্যাপার ছিল যে, তাঁরা বলতেন যে, হারামের বাহির থেকে আগত হজ্জ উমরাহকারীগন হারামের বাহির হতে খাদ্যদ্রব্য কিংবা অনুরূপ কোন কিছু নিয়ে আসলে তা তাঁদের জন্য খাওয়া ঠিক নয়।[3]

৪. আরও একটি বিদ‘আতের কথা জানা যায় এবং তা হচ্ছে, তাঁরা হারামের বাহিরের বাসিন্দাদের প্রতি নির্দেশ

দিয়ে রেখেছিলেন যে, হারামের মধ্যে প্রবেশ করার পর হুমস হতে সংগৃহীত বস্ত্র পরিধান করে তাঁদের প্রথম ত্বাওয়াফ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে হুমসের বস্ত্র সংগৃহীত করা সম্ভব না হলে পুরুষেরা উলঙ্গ অবস্থাতেই ত্বাওয়াফ করত এবং মহিলারা পরিধানের কাপড় চোপড় খুলে ফেলে দিয়ে একটি ছোট রকমের খোলা জামা পরিধান করতেন এবং ঐ অবস্থাতেই ত্বাওয়াফ করতেন। ত্বাওয়াফ কালে তাঁরা কবিতার এ চরণ আবৃত্তি করতেন :

اليوم يبدو بعضه أو كله ** وما بدا منه فلا أحله

'অদ্য কিছু অথবা সম্পূর্ণ লজ্জাস্থান উলঙ্গ হয়ে যাবে, কিন্তু যা খুলে যায় আমি তা দেখা বৈধ বলে সাব্যস্ত করি না।'

এ সমস্ত অশ্লীলতা থেকে পরহেজ করে চলার জন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

(يَا بَنِيْ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [الأعراف:31]

'হে আদাম সন্তান! প্রত্যেক সলাতের সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ কর। (আল-আ'রাফ ৭ : ৩১)

অপরদিকে, যদি কোন মহিলা কিংবা পুরুষ নিজেকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মনে করে হারামের বাহির থেকে আনা পোষাকে ত্বাওয়াফ করে নিত তাহলে ত্বাওয়াফের পর এ পোষাক তাঁকে ফেলে দিতে হতো। এর ফলে তাঁরা না নিজে উপকৃত হতেন না অন্য কেউ।[4]

৫. বিদ'আতের আরও একটি ব্যাপার ছিল, ইহরাম অবস্থায় তাঁরা দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেন না। ঘরে প্রবেশ করার জন্য তাঁরা ঘরের পিছন দিকে একটা বড় ছিদ্র করে নিয়ে সেই ছিদ্র পথে আসা-যাওয়া করতেন। অবোধ এবং আহাম্মকের মতই এ কাজকে তাঁরা পুণ্যময় কাজ বলে মনে করতেন। এ ধরণের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন :

(وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْا الْبُيُوْتَ مِن ظُهُوْرِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ) [البقرة:189]

'তোমরা যে গৃহের পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ কর, তাতে কোন পুণ্য নেই, বরং পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে, কাজেই তোমরা (সদর) দরজাগুলো দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' (আল-বাক্বারাহ ২ : ১৮৯)

উপরোল্লেখিত আলোচনা সূত্রে আমাদের মানসিক দৃষ্টিপটে দ্বীনের যে চিত্রটি চিত্রিত হল সেটাই ছিল সাধারণ আরববাসীগণের দ্বীনের স্বরূপ। মূর্তিপূজা, শির্ক, বিদ'আত, কল্পনা, কুসংস্কার, অশ্লীলতা, ইত্যাদির আবরণে চাপা পড়ে গিয়েছিল ইবরাহীম (আঃ) প্রবর্তিত সত্য ও সনাতন ইসলাম।

এ ছাড়া আরবীয় উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহুদীবাদ, খ্রীষ্টবাদ, প্রাচীনতম পারসীক যাজকতাবাদ এবং সাবাঈধর্ম স্থান দখলের সুযোগ সক্রিয় ছিল। তাই সে সবেরও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

ইহুদী মতবাদ : আরব উপদ্বীপে ইহুদীদের কমপক্ষে দু'টি যুগ অতিবাহিত হয়েছিল। প্রথম যুগটি সেই সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল যখন ফিলিস্তীনে বাবেল এবং আশুরের রাষ্ট্র বিজয়ের কারণে ইহুদীগণকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। বাহিনী কর্তৃক ব্যাপকভাবে ইহুদীদের ধরপাকড়, বুখতুনসসরের হাতে ইহুদীবসতি ধ্বংস ও উজাড়, তাঁদের উপাসনাগারের ক্ষতিসাধন এবং বাবেল থেকে ব্যাপকভাবে দেশান্তরের ফলে একদল ইহুদী ফিলিস্তীন ছেড়ে

গিয়ে হিজাযের উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।[5]

দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয় যখন টাইটাস রুমীর নেতৃত্বে রুমীগণ ৭০ খ্রীষ্টাব্দে জোর করে ফিলিস্তীন দখল করে নেয়। সেই সময় রুমীগণের বহু ইহুদী বসতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁদের উপাসনাগারের ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে বহু ইহুদী গোত্র হিজাযে পালিয়ে আসে এবং ইয়াসরিব, খায়বার এবং তাইমায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সেই সকল স্থানে তাঁরা স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন এবং কেল্লা ও গড় নির্মাণ করেন।

উল্লেখিত দেশত্যাগী ইহুদীদের মাধ্যমে আরববাসীগণের মধ্যে এক প্রকার ইহুদী প্রথা চালু হয়ে যায়। এ আরব ইহুদী সংমিশ্রণের সূত্রপাত হয় ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবস্থা ও ঘটনা প্রবাহের প্রেক্ষাপটে তা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ইসলামের আবির্ভাবকালে উল্লে-খযোগ্য ইহুদী গোত্রগুলো ছিল যথাক্রমে খায়বার, নাযীর, মুস্তালাক্ব, কুরাইযাহ এবং ক্বায়নুক্বা। বিখ্যাত সামহুদী ‘ওয়াফাউল ওয়াফা’ গ্রন্থে ১১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে তৎকালে ইহুদী গোত্রগুলোর সংখ্যা বিশেরও (২০) কিছু বেশী ছিল।[6]

ইয়ামানে ইহুদী মতবাদ বেশ বিস্তার লাভ করে। এখানে এর বিস্তার লাভের মূল হোতা ছিলেন তুব্বান আস’আদ আবূ কারাব। এ ব্যক্তি যুদ্ধ করতে করতে ইয়াসরিবে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি ইহুদী মতবাদ গ্রহণ করেন এবং বনু কুরাইযাহর দু’জন ইহুদী বিদ্বানকে সঙ্গে নিয়ে ইয়ামান যান। এভাবে ইয়ামানে ইহুদী মতবাদ বিস্তার লাভ করেন।

আবূ কারাবের পর তাঁর পুত্র ইউসুফ যূ নাওয়াস ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। শাসনভার গ্রহণ করার পর তিনি নাজরানবাসী খ্রীষ্টানগণের উপর হামলা চালান এবং ইহুদী মতবাদ চাপিয়ে দেয়ার জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। কিন্তু প্রবল চাপ সত্ত্বেও খ্রীষ্টানগণ ইহুদী মতবাদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন যার ফলশ্রুতিতে যুনাওয়াস গর্ত খনন করে সেই গর্তে অগ্নিকুন্ড তৈরি করেন এবং যুবা, বৃদ্ধ, পুরুষ-মহিলা, নির্বিশেষে অনেককে সেই অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে হত্যা করেন। বলা হয়ে থাকে যে, বিশ থেকে চল্লিশ হাজার লোক এ নারকীয় ঘটনার শিকার হয়েছিলেন। এ নারকীয় ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ৫২৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। কুরআন মাজীদের সূরাহ বূরুজে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।[7]

(قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْدِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ) [البروج: 4–7]

“ধ্বংস হয়েছে গর্ত ওয়ালারা ৫. (যে গর্তে) দাউ দাউ করে জ্বলা ইন্ধনের আগুন ছিল, ৬. যখন তারা গর্তের কিনারায় বসেছিল ৭. আর তারা মু’মিনদের সাথে যা করছিল তা দেখছিল।’ (আল-বুরূজ ৮৫ : ৪-৭)

খ্রীষ্টীয় মতবাদ : খ্রীষ্টীয় মতবাদ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হল, আরবের শহরগুলোতে ওদের আগমনের ব্যাপারটি ঘটেছিল হাবশী এবং রুমীগণের জবর দখলের পর বিজয়ীদের মাধ্যমে। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইয়ামানের উপর হাবশীগণের প্রথম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু তাদের এ রাজত্ব বেশিদিন টিকেনি। তাদের হাত হতে তা ৩৭০ থেকে ৩৭৮ খ্রিস্টাব্দ সময়ে হাতছাড়া হয়ে যায়। এ মধ্যবর্তী সময়ে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার কাজ চালাতে থাকেন। প্রায় সেই সময়েই এমন এক বুজর্গ ব্যক্তি নাজরানে আগমন করেন যাঁর প্রার্থনা আল্লাহর নিকটে কবুল হতো বলে কথিত আছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও কেরামতওয়ালা পুরুষ। তাঁর নাম ছিল ফাইমিউন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি নাজরানে খ্রীষ্টীয় মতবাদের প্রচার

কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। নাজরানবাসীগণের উপর তাঁর প্রচার কাজের প্রভাব অত্যন্ত কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হতে থাকে। তাঁরা তাঁর কাছে এমন কিছু কেরামত দেখতে পান যা তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে অধিকতর দৃঢ় করে তোলে। এরপর তাঁরা সকলেই খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন।[৪]

অতঃপর দ্বিতীয়বার হাবশগণ ৫২৫ খ্রিস্টাব্দে নূ নাওয়াস কর্তৃক খ্রীস্টানদের গর্তের মধ্যে পুড়িয়ে মারার মতো পৈশাচিক কর্মকান্ডের প্রতিশোধস্বরূপ আবরাহাহ আল-আশরাম রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করেন। রাষ্ট্র নায়কের আসনে সমাসীন হওয়ার পর নতুন উদ্যমে খ্রীষ্টীয় মতবাদের প্রচার ও প্রসার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিই হচ্ছে ইয়ামানে অন্য একটি কা'বাহ গৃহনির্মাণ এবং তাঁর নির্মিত কাবা'হ গৃহে হজ্জ পালনের জন্য আরববাসীগণকে আহবান জানানো। শাসক আবরাহা শুধু অন্য একটি ক্বাবা'হ গৃহ নির্মাণ এবং হজ্জ পালনের আহবান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি খানায়ে ক্বাবা'হকে সমূলে ধ্বংস করাতো দূরের কথা, আল্লাহ তা'আলার গজবে পড়ে বিশাল এক হস্তী বাহিনীসহ তিনি নিজেই সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেমনটি কুরআন কারীমের সূরাহ 'ফীলে' বলা হয়েছে। সূরাহ ফীলের এ ঘটনা সর্ব যুগের সকল মানুষের শিক্ষা লাভের জন্য একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

অপরদিকে রুমীয় অঞ্চল সমূহের সন্নিকটস্থ হওয়ার কারণে আলে গাসসান, বনু তাগলিব, বনু তাই এবং অন্যান্য আরব গোত্রসমূহে খ্রীষ্টীয় মতবাদ বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। হীরাহর আরব সম্রাটগণও খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

মাজুসী মতবাদ : মাজুসী মতবাদ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হচ্ছে, পারস্যের সন্নিকটস্থ আরব ভূমিতে এ মতবাদ বেশ প্রাধান্য এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যেমন- আরবের ইরাকে, বাহরাইনে (আল আহসা), হাজার এবং আরব উপসাগরীয় সীমান্ত অঞ্চলে। তাছাড়া ইয়ামানে পারস্য শাসনামলেও বিচ্ছিন্নভাবে দু-একজন মাজুসী মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন।

সাবী মতবাদ : এরপর অবশিষ্ট থাকে সাবী মতবাদের কথা। এটা এমন একটি মতবাদ যার অনুসারীরা নক্ষত্র ও তার বিভিন্ন কক্ষপথ এবং তারকারাজির প্রভাবকে এমনভাবে স্বীকৃতি দিত যে এগুলোকেই বিশ্ব পরিচালনা করে বলে বিশ্বাস করতো। ইরাক এবং অন্যান্য দেশের প্রাচীন শহর-নগরের ধ্বংসস্তুপ খননের সময় যে সকল দলিল-দস্তাবেজ হস্তগত হয়েছে তা থেকে এটা বুঝা যায় যে, তা ইবরাহীম (আঃ)-এর কালদানী সম্প্রদায়ের মতবাদ। প্রাচীন শাম এবং ইয়ামানের বহু অধিবাসী এ মতবাদের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন ইহুদী মতবাদ এবং তারও পরে খ্রীষ্টীয় মতবাদ বিস্তার লাভ করে তখন এ সাবী মতবাদের ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে পড়ে এবং প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ ক্রমান্বয়ে নির্বাপিত হওয়ার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। কিন্তু তবুও ইরাকে এবং আরব উপসাগরীয় সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এ মতবাদের কিছু সংখ্যক অনুসারী থেকে যায়।[৫]

আবার আরবের কতক স্থানে কিছু সংখ্যক নাস্তিক্য মতবাদের অনুসারীদের দেখা যেত। তারা হীরাহর পথে এখানে আসে। যেমন কুরাইশদের কতক লোককে পারস্যে পাওয়া যায় যারা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তথায় গিয়েছিল।

ফুটনোট

[1] ইবনে হিশাম ১ম খন্ড ১৯৯ পৃঃ, সহীহুল বুখারী ১ম খন্ড ২২৬ পৃঃ।

[2] ইবনে হিশাম ১ম খন্ড ২০২ পৃঃ।

[3] ইবনে হিশাম ১ম খন্ড ২০২ পৃঃ।

[4] ইবনে হিশাম ১ম খন্ড ২০৩ পৃঃ এবং সহীহুল বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ২২৬ পৃঃ।

[5] কালবে জাজীরাতুল আরব ২৫১ পৃঃ।

[6] কালবে জাজীরাতুল আরব ২৪১ পৃঃ।

[7] ইবনে হিশাম ১ম খন্ড ২০-২২ পৃঃ ২৭, ৩১, ৩৫-৩৬ পৃঃ। অধিকন্তু তাফসীর গ্রন্থে সূরাহ বুরুজের তাফসীর দ্রষ্ঠব্য।

[8] ইবনে হিশাম ১ম খন্ড ৩১-৩৪ পৃঃ।

[9] তারিখে আরযুল কুরআন ২য় খন্ড ১৯৩-২০৮ পৃঃ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6055

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন